মননমধু

রামকৃষ্ণ-
বিবেকানন্দ
সাহিত্যের
স্বনামধন্য লেখক

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

কে কার অলংকার

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে একটি জনপ্রিয় গান ছিল ভাস্কর বসুর কথায় ও সুধীন দাশগুপ্তের সুরে : ''সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে কার অলংকার।'' গেয়েছিলেন অতি সুকণ্ঠের অধিকারী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। সত্যিই, রূপের সঙ্গে অলংকারের সংযোগ রূপকে আরও ফুটিয়ে তোলে, না অলংকারকেই অলংকৃত করে তা বোঝা মুশকিল। আসলে এ-দুটিকে পৃথক করা যায় না, কারণ এরা একে অপরের পরিপূরক। এ-দুটির সম্মিলনে দৃশ্য ও দ্রষ্টা দুই-ই সার্থকতা লাভ করে। এই গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন হল শ্রীশ্রীঠাকুর আর স্বামীজীর সম্বন্ধকে নতুন আলোয় দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে।

সোনার মানুষ ঠাকুরের গলায় নরেন্দ্ররূপ মণিহারের স্বর্ণদ্যুতি ঠিক এই কথাটিই মনে করায়। যে-অখণ্ডের ঘরে ঠাকুর শিশুবেশে নরঋষির কণ্ঠলগ্ন হয়ে তাঁর মধ্যে বাৎসল্যের সঞ্চার করেছিলেন, সেই ঋষিই নরেন্দ্র হয়ে এই ধরাধামে এসে ঠাকুরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে রইলেন। সে-কণ্ঠলগ্নতার পরিচয় লীলাপ্রসঙ্গকার দিয়ে গেছেন। ঠাকুরের কণ্ঠে নরেন্দ্রের গুণগানের শেষ নেই, নরেন্দ্র হৃদয় ছেড়ে কণ্ঠে উঠে বসে আছেন, তাই দূর থেকে

নরেন্দ্রকে আসতে দেখে ''ওই ন, ওই ন'' বলতে বলতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে ডুবে যাচ্ছেন। এই পারস্পরিক কণ্ঠলগ্নতাই রামকৃষ্ণতত্ত্বকে তার উজ্জ্বলতায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করার শুধু শক্তি নয়, এক অসীম সৌন্দর্যময়তার প্রকাশ ঘটিয়ে তাকে সর্বকালে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। অন্তর্লীন শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্ব ফুটে উঠেছে রামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রের যৌথ সম্মিলনে। শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্বের ভাষ্য নরেন্দ্র, আবার নরেন্দ্রকে বুঝতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। এ যেন মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। দুপিঠে দুরকম প্রকাশ, কিন্তু দুটিকে মিলিয়েই মুদ্রার মূল্য। একই তত্ত্ব কিন্তু প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন। নরেন্দ্রের কর্মপদ্ধতির বিচার করতে গিয়ে একসময়ে ঠিক এই ভুলটাই হয়েছিল। তাঁকে পণ্ডিতসমাজ, জনসমাজ, সাধুসমাজ, এমনকী নিজের গুরুভাইদের কাছেও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। স্পষ্টবক্তা স্বামী যোগানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠার তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, ''ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল?'' তাতে উত্তেজিত স্বামীজী বলেছিলেন, ''তুই কি করে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।''[১] আসলে আমাদের স্ববিরোধিতা সঠিক বিচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মুখে আমরা বলি ঠাকুর অনন্ত ভাবময়, কিন্তু অন্য ভাবের নিন্দা বা বিরোধিতা করার সময় আমাদের সেকথা মনে থাকে না। তবে যোগানন্দজী ঠাকুরের পার্ষদ, তাই তাঁর ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি। স্বামীজীর পেছনে ঠাকুরের নিরন্তর উপস্থিতি লক্ষ করে তাঁর কাজ যে ঠাকুরের কাজ এই উপলব্ধি করে গুরুভাইরা তাঁর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

ঠাকুর বড় সহজ। তাঁর অতুল প্রতিভা, কিন্তু তা অন্তর্লীন। কামারপুকুরের গ্রাম্য মানুষজন থেকে কলকাতা শহরের নামি দামি মানুষেরা, যেখানে সাধু, পণ্ডিত, সরকারি উচ্চ আধিকারিক, ডাক্তার, উকিল সকলেই তাঁকে দেখার, তাঁর কথা শোনার এক বিষম আগ্রহ অনুভব করেন। প্রথাগত শিক্ষাহীন সধবা-বিধবা মায়েরা, ছোটখাট ব্যবসায়ী, দারোয়ান, গাড়োয়ান থেকে রসিক মেথর পর্যন্ত সকলেরই তাঁর প্রতি এক দুর্বার টান। তাঁর প্রতিভার জাগতিক প্রকাশ তাঁর শ্রুতিধরত্বে। একবার শুনেই, তা গানই হোক বা শাস্ত্র অথবা বিশেষ কোনও কথা, তা তাঁর মনে থেকে যায় এবং যথাসময়ে তার নিখুঁত প্রয়োগ ঘটে। তিনি মঞ্চের বক্তা নন, কিন্তু অসম্ভব বৈঠকি মানুষ। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর বৈঠকখানায় তিনিই মধ্যমণি, কারণ তিনি যা বলেন ও যেভাবে বলেন তা মনের মধ্যে দাগ রেখে যায়। শ্রোতাদের মনে হয় এমন কথা তাঁরা আগে কখনও শোনেননি। তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয় না এমন মানুষ নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিভার এটুকুই বাহ্য প্রকাশ। বাকিটুকু তাঁর অধ্যাত্মশক্তিতে, যা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। ''আমার মনের কোণের বাইরে/ আমি জানলা খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাই রে''—মনের সংকীর্ণ কোণ থেকে বেরিয়ে তার অধ্যাত্মমুখী জানালার দৃষ্টি না খুললে তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর, ''আমি কেমন?'' তাঁর ঝটিতি উত্তর, ''আপনি **সরল আবার গভীর**—আপনাকে বুঝা বড় কঠিন।''[২] 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্'—সোনার পাত্র দিয়ে সত্যের মুখ ঢাকা। সোনার চাকচিক্যে মানুষ মুগ্ধ, তার পিছনে সত্যদর্শনে তার আগ্রহ নেই। তাই তিনি বাহ্যরূপ চাননি, যে-রূপে তাঁর সোনার অঙ্গে সোনার কবচ মিশে থাকত। গা চাপড়ে চাপড়ে বলতেন ''ঢুকে যা ঢুকে যা,'' চাইতেন তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিক উদ্ভাস সকলের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করুক। তাঁর মধ্যে দুটি—ব্রহ্মশক্তি নিজে, আর তার সঙ্গে তাঁর বালকরূপী সন্তান। বালকরূপে তিনি

আবদার করেন কিন্তু মা তাঁর লীলা চালাতে প্রয়োজনের বেশি দিতে রাজি নন। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে লড়াই চলে, আবার বালকভাব চলে গেলে দেখেন, সবাই সে-পথের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁর আর্তি এতটাই যে, ক্যানসারের অসহ্য যন্ত্রণার মাঝেও বলছেন, ‘‘শরীরটা কিছুদিন থাকত, লোকদের চৈতন্য হত।... তা রাখবে না,—সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে!’’[৩] মনে হয়, যদি যোগ্যতা না থাকলে অধ্যাত্মপথের অধিকারী হওয়া যায় না, তাহলে তাঁর আসার দরকার কী ছিল। দরকার দুটি কারণে। প্রথম—যোগ্যতা লাভের উপায় যা আমাদের জানা আছে তা নানা সংশয়ে দীর্ণ। ‘সংসারেরই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা’—সংসারের কামনা-বাসনার দোলনায় দুলে আমাদের স্থিরতার অবকাশ কোথায়? তার মধ্যেও কীভাবে সে-দুলুনি ক্রমশ কমিয়ে আনতে হবে ও উদ্দেশ্যে স্থির হতে হবে, সে-পথ দেখাতে এলেন গ্রাম্য পরিবেশে, অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে, চালকলা বাঁধা বিদ্যে পরিত্যাগ করে—যা জানলে সব জানা হয়ে যায় সে-বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করতে। সেই পূর্ণতার বাহ্য প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর নরেন্দ্রের কণ্ঠের মণিহার হয়ে। জগন্মাতাকে বলেছিলেন শরীরটাকে একটু ঠিক করে দিতে যাতে মানুষের দোরে দোরে গিয়ে তাঁর অধ্যাত্মভাবনা দিতে পারেন, কিন্তু মা তা দেননি। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে নিজের সাধনের সমস্ত ফল, এমনকী জপের মালা পর্যন্ত সমর্পণ করে তাঁকে বিশ্বমাতৃত্বে বোধিত করলেন, যিনি স্নেহের আঁচলে সবাইকে বেঁধে তাঁর ভাবরাজ্যে এনে হাজির করবেন। আর নরেনকে তাঁর পরাবিদ্যার সবটুকু দিয়ে লিখিত ঘোষণা করে দিলেন—‘‘নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘুরে বাহিরে হাঁক দিবে।’’ তাঁর স্থূলদেহ চলে গেলেও সূক্ষ্মদেহ নরেনের কণ্ঠে মণি হয়ে জ্বলতে লাগল। এই কণ্ঠলগ্ন মণিহারের মূল্য নির্ধারণ করতে না পেরে অধ্যাপক রাইট লিখলেন শিকাগোর ধর্মমহাসভার অধ্যক্ষকে—আমাদের দেশের সব পণ্ডিতের মেধা এক করলেও এঁর সমকক্ষ হবে না। আরও লিখলেন—এঁর কাছে পরিচয়পত্র চাওয়ার অর্থ সূর্যকে জিজ্ঞাসা করা তার আলো দেওয়ার কী অধিকার আছে। ভাবাবেগবর্জিত এক বিদেশি পণ্ডিতের এই মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা এই যৌথ অলংকারের দ্যুতির একটু আভাস পাই। তৈরি হল তাঁর ভাবপ্রচারের সে-দ্যুতিময় দুরন্ত রথ, যে-রথের পরিক্রমণ চলবে হেসেখেলে আগামী দেড়হাজার বছর। দ্বিতীয়—যাঁদের আধ্যাত্মিক পথে চলার যোগ্যতা আছে এবং প্রার্থনায় রত—‘‘তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে’’ (ঈশোপনিষদ, ১৫) —হে জ্যোতির্ময় পুরুষ, তুমি সেই আবরণকে উন্মোচিত করো যাতে আমার সত্যের দর্শন হয়—তাঁরাও সত্যের মুখ ঢাকা সোনার থালার চাকচিক্যে বিভ্রান্ত। বিভ্রান্ত বহু মত ও পথের ঘূর্ণিপাকে, যার শেষ কেউ দেখেনি অথচ বিবাদেরও বিরাম নেই। এ-বিভ্রান্তি কাটাতে আগে কেউ বলেননি এমন করে সোনার অঙ্গে চাপড় মেরে—এ-রূপের চাকচিক্য চলে যাক, আর অন্তরের সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক যাতে যথার্থ সত্যান্বেষী সত্যকে দর্শন করতে পারে। এরকম করুণা জীবের প্রতি কে দেখেছে? শ্রীরামকৃষ্ণ-সমুদ্রের গভীরতা মাপতে নুনের পুতুল হয়ে সে-অসীমতায় ডুবে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তারপর ‘কে আর খপর দিবেক।’ আসলে তিনি তো নিজেকে বোঝাতে আসেননি, আমাদের বুঝে নিতে বলেছিলেন যার প্রাণে যতটুকু ধরে।

কিন্তু নরেন্দ্রের শ্রীরামকৃষ্ণের অলংকার হয়ে ওঠার পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। যাঁকে ভারতের অবর্ণনীয় আর্থিক দারিদ্র্য ও পতন এবং সেইসঙ্গে জগতের ধনীসমাজের আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য ও মানসিক পতনের মোকাবিলা করতে হবে তাঁকে তো ‘সব ঘর

ঘুরে তবে চিকে' উঠতে হবে! তাই অকালে পিতৃবিয়োগ, অভ্যস্ত সচ্ছলতা থেকে দুমুঠো অন্নের জন্য পরিবারের হাহাকার, আত্মীয়বর্গের স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতার বীভৎস রূপ, স্নাতক এবং সেই বয়সেই অসীম পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও সামান্য চাকরি না পাওয়া—এইসব অভিজ্ঞতা যেন পরিকল্পিত ছিল। নিজ পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর কর্তব্যবোধকে জগতের সকলের প্রয়োজন মেটানোর কর্তব্যবোধে পরিণত করার দাবি পিছু ছাড়েনি। শ্যামপুকুর বাটীতে ঠাকুর তাঁকে ত্যাগ বৈরাগ্যের উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন, ''তীব্র বৈরাগ্য হলে ও-সব হিসাব থাকে না। 'বাড়ির সব বন্দোবস্ত করে দিব, তারপরে সাধনা করব'—তীব্র বৈরাগ্য হলে এরূপ মনে হয় না।''[৪] কথাগুলি শুনতে শুনতে মায়ের দুঃখ, ভাইদের অন্নক্লিষ্ট মুখ মনে পড়ে হতাশায় শুয়ে পড়ছেন নরেন্দ্র। একদিকে তাঁর মা-ভাইদের উপবাসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্বপালনে অক্ষমতা, আর একদিকে সমগ্র জগতকে অধ্যাত্ম উপবাসের হাত থেকে রক্ষা করার আহ্বান। ক্ষুদ্র এক সংসারের হাল ধরা ছেড়ে এই জগতের দিঙ্‌নির্ণায়ক হাল ধরার আহ্বান। ঠাকুর তাঁকে কী কাজের জন্য প্রস্তুত করছেন তা বোঝার ক্ষমতা তখন কারও ছিল না।

ঠাকুর একদিন অন্তরঙ্গ মহলে বলছেন, ''সেদিন... দেখলাম খোলটি (দেহটি) ছেড়ে **সচ্চিদানন্দ** বাহিরে এল, **এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার।** তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ওই সব বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম... পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।''[৫] তবে পূর্ণ সত্ত্বগুণী শরীরে ভাবজগতে প্রচার হতে পারে কিন্তু তাকে একটি আন্দোলনের রূপ দিতে রজোগুণের বাহন দরকার, যা হবে সত্ত্বের রজঃ। অতএব তাঁর অতি আদরের নরেনের প্রার্থনা পূরণ করলেন না। তিনি ঠাকুরের মতো রাজার ব্যাটা হতে চান, সগুণ ও নির্গুণের মাঝে বাচ খেলতে চান, শরীর রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে জগতে ফিরতে চান। ঠাকুর অনুমোদন তো দিলেনই না, বরং তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন, ''ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিসনি। আমি বাপু সব ভালবাসি।... একঘেয়ে ভাল লাগে না। তুইও তাই কর—একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত দুই হ।''

নরেনের সমাধিলাভের পর ঠাকুর তাঁকে বললেন, ''কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন? চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলব।''[৬] শুধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না, একদিন নরেনকে সামনে বসিয়ে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। নরেনও বাহ্যশূন্য। চেতনা ফিরলে দেখলেন ঠাকুরের চোখে জল। ঠাকুর বললেন, ''তোকে আজ সর্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম।'' অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল-করা মানুষগুলোর জন্য তীব্র আর্তি চোখের জল হয়ে বেরিয়ে, নরেনের হৃদয়ে নিজের ভাবনা ছেড়ে কেবল অপরের ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলার পথকে উজ্জ্বল করে রাখল। প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে স্বামীজী প্রমদাদাস মিত্রকে লিখছেন, ''আপনি জানেন না—কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্বনাশ করিতেছে। একটুকুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি।'' জগৎ দেখল সন্ন্যাসের এক নতুন ধারা। জগৎ মিথ্যা এ-বিশ্বাসে নিজমুক্তির সাধনে হৃদয়হীন হওয়া নয়। সমাজসচেতন, অপরের দুঃখসচেতন এক সর্বগ্রাসী প্রেমের অধিকারী হওয়া। এ তো শ্রীরামকৃষ্ণেরই

সিদ্ধান্ত, নরেন্দ্ররূপে যার প্রকাশ। তাই নরেন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারেন, ‘‘এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।’’ এই সিদ্ধান্তের বিশ্বাসেই তিনি প্রমদাবাবুর জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন, ‘‘যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি—হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবান্, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।’’[৭] তাঁকে বহু জীবের আশ্রয়স্থল বটবৃক্ষ হয়ে ওঠার জন্য ঠাকুর যে-বীজ তাঁর মধ্যে রোপণ করেছিলেন তারই প্রেরণায় তাঁকে ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষকে চিনতে হয়েছিল। কন্যাকুমারীর শেষ শিলাখণ্ডে বসে ধ্যানে জানতে হয়েছিল তাঁর জোর কোথায় আর দুর্বলতাই বা কোথায় এবং তার সমাধানই বা কী। তাই তাঁকে ভ্রমণের শেষপাদে স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে বলতে শুনি—‘‘হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।’’[৮]

এই অনুভবের প্রেরণায় তিনি নির্বিকার চিত্তে বলতে পারেন—‘‘যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।’’[৯] তিনি বলেছিলেন ‘রামকৃষ্ণের জুড়ি নাই’, আমরা বলি বিবেকানন্দেরও জুড়ি নাই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এক অদ্ভুত জুটি, সোনা আর তার ঔজ্জ্বল্যের মতো, একটিকে ছেড়ে আর একটিকে ভাবা যায় না। তাঁর লেখা কবিতার একটু অংশ—‘‘প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বস্ব আমার,/ তুমি এখানে, এত কাছে,—আমারি হৃদয়ে?/ আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল রাজার গৌরবে!/ সেইদিন থেকে যখনই যেখানে যাই/ বুঝেছি হৃদয়ে, তুমি আছ পাশে পাশে/ পর্বতে—উপত্যকায়—শিখরে—সানুতে—/দূরে বহু দূরে, ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে।’’ তাঁর এ-সমর্পণের কি শেষ খুঁজে পাওয়া যায়? প্রসঙ্গত পূজনীয় স্বামী বিশ্ববেদানন্দজীর একটি কথা মনে পড়ে। কোনও জায়গায় যাওয়ার সময় বাসে তিনি একটি লেখা দেখতে পান—‘‘কণ কণ সে তুঝকো ঢুঁড়া তেরা পতা নেহি/ যব তেরা পতা মিলা তো মেরা পতা নেহি।’’ আমাদের লেখাটি পাঠিয়ে বললেন, ‘‘এই দৃষ্টিতে আয় আমরা স্বামীজীর রচনাবলি পড়ি।’’ যখন তাঁকে আমরা সেখানে খুঁজে পাব তখন আমাদের আর এই ঠিকানা থাকবে না। মনে হয় একই ভাবে আমরা ঠাকুর-স্বামীজীর পারস্পরিক অলংকরণের এই ভাবটি নিয়ে মনন করলে তাঁদের যৌথ প্রয়াসের অতিক্ষুদ্র অংশীদার হয়ে ধন্য হব। কারণ শুরুতে যে-গানের কথা লিখেছি তার পরের পঙ্‌ক্তিটি—‘কে জানে তার এ-রূপ দিল সে কোন মণিকার’; শ্রীরামকৃষ্ণরূপ সোনার হাতে বিবেকানন্দরূপ সোনার কাঁকনের মণিকার যিনি মণিও তিনিই।

তথ্যসূত্র

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, খণ্ড ৩, ২০০১, পৃঃ ১১ [এরপর, *যুগনায়ক*]

২। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন কার্যালয়, অখণ্ড, ২০০১, পৃঃ ২৯৫

৩। তদেব, পৃঃ ১০২৩

৪। তদেব, পৃঃ ৯৭০

৫। তদেব, পৃঃ ৭৬২

৬। *যুগনায়ক*, খণ্ড ১, ২০০১, পৃঃ ১৫১-৫২

৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ ৩৫-৩৭ [এরপর, *পত্রাবলী*]

৮। *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৪০

৯। *পত্রাবলী*, পৃঃ ২২৩